৮

সপ্তদশ শতকে ভারতে মুদ্রা-অর্থনীতির প্রসারের কয়েকটি দিক

সতীশ চন্দ্র

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতক এশিয়ার ইতিহাসে অতীব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। ঐ সময়েই ইউরোপের কয়েকটি দেশে জাতি-রাষ্ট্র গঠিত হওয়ার পর শিল্পোন্নত সমাজের উপযোগী প্রযুক্তি ও প্রতিষ্ঠানসমূহ দেখা দেয় এবং এশিয়ায় ও পৃথিবীর অন্যান্য অংশে ঔপনিবেশিক প্রভুত্ব স্থাপনের প্রক্রিয়াটির সূচনা হয়। নতুন বিশ্বে স্পেন ও পর্তুগালের দেশজয় ও উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া থেকে এই প্রক্রিয়াটি ছিল অনেকটাই আলাদা। এশিয়ার বিভিন্ন দেশে এই নতুন ঔপনিবেশিক শাসনের প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি এবং ঐ সব দেশের সমাজ জীবনে এর অভিঘাতকে অনুধাবন করতে হলে পশ্চিমি বিজয় ও প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার আগে ঐ দেশগুলিতে যেসব গভীরপ্রসারী প্রবণতা সক্রিয় ছিল সেগুলিকে ভালোভাবে পর্যালোচনা করে দেখা আবশ্যক।

সপ্তদশ শতকে ভারতীয় সমাজের বিবর্তন দুটি প্রধান ঘটনার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। প্রথমটি, মুঘল সাম্রাজ্যের আকারে একটি কেন্দ্রীভূত ও শক্তিশালী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ও সংহতি সাধন। মুঘল সম্রাটরা যে রাজনৈতিক ব্যবস্থা উদ্ভাবন করেছিলেন, সেটি, তাদের আভ্যন্তর নীতি (বিশেষত কৃষি ও বাণিজ্য সংক্রান্ত) এবং সম্রাটের ছত্র-ছায়ায় লালিত শাসক শ্রেণিগুলির চরিত্র ও তাদের গভীরতর চাহিদা, এদেশের সামাজিক বিবর্তনকে সুনির্দিষ্ট গতিমুখ দিয়েছিল। দ্বিতীয় ঘটনাটি, বিভিন্ন বন্দর শহর ও আভ্যন্তর বাণিজকেন্দ্রে ইউরোপীয় বাণিজ্যিক সংস্থার (ফ্যাক্টরি নামে পরিচিত) প্রতিষ্ঠা ও ইউরোপের বাজারগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপন। উল্লেখ্য যে, সপ্তদশ শতকে ইউরোপীয় বণিকদের কাজকর্ম কোনো কোনো পণ্যের (যার একটা বড়ো অংশ হস্তশিল্প ও যন্ত্র শিল্পজাত) চাহিদার প্রসারে সহায়ক হয়েছে এবং, অন্তত প্রাথমিক পর্যায়ে, এর ফলে সুপ্রতিষ্ঠিত ভারতীয় বণিকদের ভয়ানক বিপদের সম্মুখীন হতে হয়নি।[১]

ভারতীয় সমাজের উপর উল্লিখিত ঘটনা দুটির প্রভাব বর্তমান নিবন্ধের আলোচ্য নয়। ঐ দুটি এবং অন্যান্য ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় সপ্তদশ শতকে যে মুদ্রা-অর্থনীতির বিকাশের প্রবণতা দেখা গিয়েছিল, এখানে শুধু সেই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির প্রতিই দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে।

প্রথমেই একটা কথা বিশেষ করে বলে নেওয়া দরকার। মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠার কিংবা ইউরোপীয় বণিকরা এদেশে আসার আগে ভারতীয় অর্থনীতি কোনোভাবেই সরল এবং শুধুমাত্র স্বাভাবিক জীবনধারণের উপযোগীই ছিল না।[২] প্রাচীনকাল থেকেই ভারতে ভালোরকম আভ্যন্তর বাণিজ্য দেখা গেছে। তাছাড়া পূর্ব ও পশ্চিমের প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে বহির্বাণিজ্যও যথেষ্ট বিস্তৃতি লাভ করেছিল।[৩] বহু বাণিজ্যকেন্দ্রে উন্নত নাগরিক সংস্কৃতিও গড়ে উঠেছিল। যার ফলে, কৃষি ও যুদ্ধবিদ্যাই শুধু উৎকৃষ্ট পেশা, এই সাবেকি ধারণা বর্জিত হয়েছিল।[৪] ভারতের বহু স্থানে হস্তশিল্প বিশেষ করে বিভিন্ন ধরনের বস্ত্র ও ধাতু শিল্পের উৎকর্ষ ঘটেছিল। এছাড়া, নগদা ফসল যেমন আখ, তৈলবীজ, তুলো, নীল ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হত। কিন্তু এসব সত্ত্বেও, নানা কারণে মুদ্রা-অর্থনীতির প্রচলন তেমন হয়নি। গ্রামগুলি অধিকাংশই ছিল স্বনির্ভর, বাইরে থেকে প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামান্যই আসত। বাণিজ্য চলত শুধু বড়ো শহরগুলির মধ্যে। তাও অত্যধিক পরিবহণ ব্যয়, রাস্তাঘাটের দুরবস্থা এবং বহু অঞ্চলে আইন-শৃঙ্খলার অভাবের জন্য খুবই সীমিতভাবে। শাসক শ্রেণির হাতে উদ্বৃত্তের পরিমাণ বিশেষত নগদ অর্থে, — ছিল আর একটি বাধা। ঐ উদ্বৃত্তের প্রধান উৎস ছিল, কৃষক শ্রেণি। কাজেই মোটামুটিভাবে বলা যায়, আয় ছিল অস্থিতিস্থাপক এবং প্রচলিত আইন রাজনৈতিক কারণ ও সামাজিক ব্যবস্থা ইত্যাদির দ্বারা সীমাবদ্ধ। তাছাড়া প্রাচীন যুগে ও আদি মধ্যযুগে (অর্থাৎ প্রাক্‌-মুঘল আমলে) ভূমি-রাজস্ব আদায় হত সাধারণত দ্রব্যে, নগদ অর্থে নয়।

এ সবই সপ্তদশ শতক জুড়ে কার্যকর ছিল। তবে কতকগুলি ঘটনা থেকে মনে হয় সমাজ জীবনে কিছু নতুন শক্তিও তখন ক্রিয়াশীল হয়েছিল। এর একটি, ঐ সময়ে শহরাঞ্চলের দ্রুত সম্প্রসারণ। উত্তর আগ্রা, দিল্লি, লাহোর, আহ্‌মেদাবাদ, সুরাট এবং ঢাকা শহরের দ্রুত প্রসার ঐ সময়ে ঘটেছে। সমসাময়িক পৃথিবীর বৃহত্তম নগরগুলির সঙ্গে এদের তুলনা করা যেত। বার্ণিয়ে বলেছেন, দিল্লি প্যারিসের চেয়ে খুব একটা ছোটো ছিল না, আর আগ্রা ছিল দিল্লির থেকেও বড়ো শহর। মন্সেরেটও একই কথা বলেছেন লাহোর সম্পর্কে।[৫] আহ্‌মেদাবাদ, পাটনা ও ঢাকা সম্পর্কেও অনুরূপ তথ্য পাওয়া যায়।[৬] সেযুগে লন্ডনের মতো দ্বিতীয় আর একটি শহর সারা ব্রিটেনে ছিল না; ফ্রান্সের ক্ষেত্রেও একই কথা বলা চলে। কিন্তু সাম্প্রতিক একটি গবেষণা[৭] থেকে জানা গেছে যে উত্তর ভারতেই (ক) ৫০,০০০ এবং ততোধিক, (খ) ২০,০০০ থেকে ৫০,০০০ এবং (গ) ১০,০০০ থেকে ২০,০০০ লোকসংখ্যার শহর এতদিন যা ভাবা হত তার থেকে অনেক বেশি ছিল। বস্তুত ঐ গবেষণার ভিত্তিতে এরকম সিদ্ধান্ত করা সম্ভব যে মুঘল আমলের[৮] মোট জনসংখ্যার কথা মনে রাখলে, সপ্তদশ শতকে শহরবাসীর আনুপাতিক হার ছিল ঊনবিংশ শতকের শেষভাগের তুলনায় অনেক বেশি। ঐ সময় শহরের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে জড়িয়ে ছিল আর একটি ঘটনা — দলে-দলে কৃষক জমি ছেড়ে শহরে পালিয়ে আসছিল। অনেক সমসাময়িক পর্যবেক্ষক[৯] এই ঘটনা সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন। তাছাড়া সে যুগের ফার্সি লেখাপত্রেও[১০] বার বার এর উল্লেখ দেখা যায়। রাষ্ট্রীয় দমন-পীড়নের জন্য কৃষক শ্রেণির ক্রমাগত ভিখিরিতে পরিণত হওয়াই

এর একমাত্র কারণ নয়, বিকাশমান শহরগুলিতে উন্নতমানের জীবনযাত্রা ও নগদ মজুরির প্রলোভনও ছিল।

সপ্তদশ শতকের আর একটি বৈশিষ্ট্য, ঐ সময় মুঘল অভিজাতদের মধ্যে বাণিজ্যিক মানসিকতার প্রসার ঘটে। যাদের আয়ের প্রধান উৎস জমি, এমন সব শাসক শ্রেণির মতোই প্রথম দিকের তুর্কি অভিজাতরাও বাণিজ্যকে হেয় জ্ঞান করতেন। তবে *আইন-ই-আকবরী*-তে আবুল ফজলের একটি মন্তব্য থেকে বোঝা যায় যে ষোড়শ শতকের শেষ দিকেই দ্রুত অবস্থার পরিবর্তন ঘটছিল। আবুল ফজল লিখছেন, "একজন অভিজাত ব্যক্তির অল্প-সল্প বাণিজ্যিক আয়, এবং দ্রব্য ও সরঞ্জামের একটা অংশ সংরক্ষণ করে কিংবা অন্যের ব্যবসায়ে কিছুটা বিনিয়োগ করে লাভজনক কাজকর্ম অনুমোদনীয়।" আবুল ফজল সুদ গ্রহণ সম্পর্কে ইসলামের নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করেছেন এই বলে যে, (সুদের) "একটা অংশ ঋণ গ্রহীতাকে দেওয়া যেতে পারে।" তিনি লিখেছেন, "বাণিজ্যিক লেনদেনের ক্ষেত্রে স্পষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়, এবং কোনোরকম গ্লানিবোধকে মনে স্থান না দেওয়াই কর্তব্য।"[১১]

সপ্তদশ শতাব্দীর ভারত সম্পর্কে ইউরোপীয় এবং ফার্সি গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে অভিজাতদের এবং রাজা, রাজপুত্র, রাজকন্যা ও অন্তঃপুরিকাবৃন্দসহ রাজপরিবারের সদস্যদের মধ্যে বাণিজ্যে অংশগ্রহণ ছিল সুপ্রচলিত। জাহাঙ্গীর, নূরজাহান, শাহজাদা খুরম (শাহ্‌জাহান) এবং এমনকী আকবরের বিধবা পত্নী, জাহাঙ্গীরের মাও ছিলেন বাণিজ্যপোতের মালিক, যেগুলি সুরাট ও লোহিত সাগরের বন্দরগুলির মধ্যে চলাচল করত। শাহ্‌জাহান যখন গুজরাটের রাজপ্রতিনিধি (ভাইসরয়), তাঁর জাহাজ থান-কাপড়, সুতিবস্ত্র, লাক্ষা, নীল ও এমনকী, তামাকও নিয়ে যেত।[১২] সিংহাসনে আরোহণের পরেও আমরা দেখেছি শাহ্‌জাহান এটি চালু করেছিলেন। পরে আমরা দেখেছি, শাহজাদী জাহানারার নিজের জাহাজ ছিল, তাছাড়া তিনি পণ্য চালানের জন্য ওলন্দাজ ও ইংরেজ জাহাজও ভাড়া করতেন। দারা এবং আওরঙ্গজেবেরও নৌবহর ছিল, যেগুলি লোহিত সাগরের বন্দর ও আফ্রিকার মধ্যে বাণিজ্যে ব্যবহৃত হত। এছাড়া আসফ খাঁ, সফি খাঁ, মীরজুমলার মতো প্রভাবশালী আমিররাও জাহাজের মালিক ছিলেন।[১৩] লাহোরে যা কিছু কেনাবেচা হত লাহোরের রাজ্যপাল হিসেবে ওয়াজির খাঁ সেই সবের ওপর দস্তুরি পেতেন। বাংলায় মীরজুমলা, ও তাঁর পরে শায়েস্তা খাঁ প্রধান প্রধান পণ্যের ব্যবসাকে একচেটিয়া করে ফেলতে চেষ্টা করেছিলেন। মীরজুমলার একটি নৌবহর ছিল, এবং তিনি বর্মা, মাক্কাসর, মালদ্বীপ, পারস্য, আরব ইত্যাদি দেশগুলিতে প্রচুর বাণিজ্য করতেন।[১৪] শুধু যে বড়ো আমিররাই সওদাগরি করতেন তা নয়। সুরাটে নিযুক্ত ইংরেজ প্রতিনিধি ১৬০৪ খ্রিস্টাব্দে লিখছেন :

> "এ দেশের সবধরনের লোকই যেমন আমাদের পছন্দ করার ভান করে, তেমনি আমি নিশ্চিত যে, তারা তাদের সমুদ্র বেদখল হয়ে যাবার জন্য আমাদের ভয়ও করবে, কারণ ছোটো বড়ো সকলেই এখানে সওদাগর।"[১৫]

সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি অভিজাতদের সওদাগরি কাজকর্মে লিপ্ত হওয়াও চালু

হয়ে গিয়েছিল যে, একজন ধর্ম-প্রচারক কাজি আব্দুলা ওয়াহাব পর্যন্ত কয়েকজন সওদাগরের মাধ্যমে গোপনে বাণিজ্য শুরু করেছিলেন।[১৬]

ছোটো-বড়ো অধিকাংশ আমিরই সাধারণত কোনো-না-কোনো ইউরোপীয় দেশের জাহাজে তাদের পণ্য রপ্তানি করতেন এবং অপেক্ষাকৃত বিরল হলেও, তাদের টাকা ধার দিতেন।[১৭] এমনও নজির আছে যে, সম্রাটের অনুমতি নিয়ে কিংবা অনুমতি ছাড়াই — তঙ্কশালা ও কোষাগার থেকে টাকা ধার দেওয়া হয়েছে।[১৮] সমসাময়িক ফার্সি বিবরণী এবং ইংরেজ পর্তুগিজ ও ওলন্দাজ নথিপত্র খুঁটিয়ে দেখে অভিজাতদের এই ধরনের বাণিজ্যিক কাজকর্মের পূর্ণ বিবরণ তৈরি করা সম্ভব।

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, মুঘল শাসক শ্রেণি ক্রমশই বাণিজ্যমনা হয়ে উঠেছিল। যদিও তখনো জমিই ছিল আয়ের মুখ্য উৎস, তার পাশাপাশি বাণিজ্য ও বাণিজ্য থেকে আয়ও অন্যতম প্রধান গৌণ উৎস হয়ে দেখা দিয়েছিল। কেউ মারা গেলে তার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার অথবা কর্মচারিদের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির উপর সম্রাটের দাবির মুঘল প্রথাটি তখনও প্রচলিত ছিল। তা সত্ত্বেও অভিজাতদের বিপুল সম্পত্তি অর্জন ও বংশপরম্পরায় হস্তান্তর বাধাপ্রাপ্ত হয়নি।[১৯] সম্ভবত এই সম্পত্তির একটি অংশ ব্যবসায়ে লগ্নি হত বা সুদে খাটানো হত। আয়ের আরেকটি উৎস ছিল শহুরে সম্পত্তি — যেমন দোকান, বাজার (পুর), সরাই ইত্যাদিতে — টাকা লাগানো।[২০] এইভাবে একটি শহুরে অবসরভোগী শ্রেণির উদ্ভব হচ্ছিল যারা শহরাঞ্চলের সম্পত্তি থেকে বসে খেত।

ভারতীয় গ্রাম-সমাজের সনাতন অর্থনৈতিক বিচ্ছিন্নতা ও স্বয়ংসম্পূর্ণতার সঙ্গে মুদ্রা-অর্থনীতির এই প্রসার কতটা মানানসই ছিল — এই জটিল প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বর্তমানে ইতিহাস সম্পর্কে আমরা যতটা জানি তাতে সম্ভব নয়। ভারতীয় সমাজের বিবর্তনধারাকে সঠিকভাবে অনুধাবন করার জন্য ভারতের গ্রাম-সমাজের সাংগঠনিক রূপ সম্পর্কে আরও ভালো করে জানা দরকার। কিন্তু ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার আগের পর্ব সম্পর্কে প্রাপ্য তথ্যাদি এত স্বল্প যে তা একটি বড়ো বাধা। অবশ্য সপ্তদশ শতকের কৃষি ব্যবস্থা সম্পর্কে বহু ফার্সি, রাজস্থানি ও মারাঠি নথিপত্র পাওয়া গেছে। সেগুলি সুবিন্যস্তভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখলে বিভিন্ন অঞ্চলের গ্রামের অর্থনৈতিক সংগঠন ও তার বিকাশের প্রবণতার উপর আলোকপাত হতে পারে।[২১]

বর্তমানে শুধু অনুমানের ভিত্তিতেই হয়তো কিছু কথা বলা সম্ভব। ভারতীয় গ্রাম-সমাজের সংগঠনে কয়েকটি মৌলিক সাদৃশ্য ছিল। কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণে আঞ্চলিক ও স্থানীয় বৈচিত্র্যও যে ছিল, সে কথা ভুললে চলবে না। আয়তন, জনসমষ্টির অভ্যন্তরীণ বিন্যাস, ভৌগোলিক অবস্থিতি, যার মধ্যে শহর বা বন্দরের নৈকট্য গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে হস্তশিল্পের নির্দিষ্ট কোনো একটি শাখার প্রসার ইত্যাদি গ্রামের অন্তর্জীবনকে প্রভাবিত করতে পারত এবং করতও। যে গ্রামগুলিতে চাষী নয় এমন 'উচ্চবর্ণের' লোকেরা বাস করত সেখানে মজুরি-শ্রমিক বা আধা-ভূমিদাসের আনুপাতিক সংখ্যা ছিল বেশি। কোনো কোনো গ্রাম বিশেষ কারিগরিতে এত দক্ষতা অর্জন করেছিল যে, গ্রামের প্রয়োজন মেটানো ছাড়াও বৃহত্তর বাজারের জন্যও উৎপাদন করত। যেমন করমণ্ডল উপকূল, সুরাট,

আহ্‌মেদাবাদ, আগ্রা, লাহোর ও অযোধ্যার বিভিন্ন এলাকায় এবং বাংলার কয়েকটি জায়গায় গ্রামে ব্যাপকভাবে বস্ত্র উৎপাদিত হত বহির্বাজারের জন্য। যদিও ঐসব অঞ্চলে উৎপাদন সংগঠন ছিল কুটিরশিল্পভিত্তিক, কিন্তু তা নিয়ন্ত্রিত হত বড়ো ব্যবসায়ী ও দালালদের দ্বারা, এবং মূলধনও যোগাত তারাই। ফলে এই ধরনের গ্রামে প্রতিদিনের জীবনযাত্রায় মুদ্রার প্রচলন ক্রমাগত বাড়ছিল। অন্যান্য কয়েকটি অঞ্চলে নীল, তুলা, আখ, তৈলবীজ ইত্যাদি প্রসার ঘটেছিল চাষের পণ্যশস্য। এইসব অঞ্চলের গ্রামের সঙ্গে শুধু জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় চাষ-আবাদরত গ্রামগুলির জীবনযাত্রার সঙ্গতি কতটা ছিল, তা জানা যায় না। যেমন, জানা নেই — পণ্যশস্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থ কৃষকরা কীভাবে ব্যয় করত? তা-কি গ্রামেই খরচ হত, নাকি শহরে তৈরি জিনিসপত্র কেনায় এর একটা অংশ ব্যয় হত?[২২] গ্রাম-জীবনের সংগঠনে অবিকল একরূপতা বলতে কিছু ছিল না। মুদ্রা অর্থনীতির প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে উন্নত এলাকার চাষী এবং কারিগররাও বিশ্ব-বাজারের ঘূর্ণিটানে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা দেখা গিয়েছিল। এবং সুতিবস্ত্র বা নীল ইত্যাদির দর পড়ে গেলে শুধু ব্যবসায়ী নয়, বহুসংখ্যক চাষীও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

মুদ্রা-অর্থনীতির প্রসার মুঘলদের রাজস্বনীতিরও সহায়ক হয়েছিল। আকবরের আমল থেকেই মুঘল সরকার কর নির্ধারণ ও আদায় করত প্রধানত নগদ অর্থে। এই ব্যবস্থা অবশ্য সর্বত্র সমানভাবে প্রয়োগ করা যায়নি; তবে সাম্রাজ্যের মধ্যস্থলে অর্থাৎ পাঞ্জাব, দিল্লী, আগ্রা, অযোধ্যা, এলাহাবাদ ও গুজরাটে ভূমি-রাজস্ব নির্ধারিত ও আদায় হত নগদে, যদিও ভাগচাষ পুরোপুরি বাতিল হয়নি। এই নতুন ব্যবস্থা বাহ্যত গ্রামীণ শস্য-ব্যাপারিদের ও বণিকদের অবস্থা অনকটাই ফিরিয়ে দিয়েছিল।[২৩] চিরকালই কয়েকটি গ্রাম নিয়ে একেকটি শস্য-সংগ্রহের কেন্দ্র (মাণ্ডি) এবং কয়েকটি মাণ্ডি নিয়ে এক একটি আঞ্চলিক বড়ো মাণ্ডি ছিল। বড়ো মাণ্ডিগুলির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল বড়ো বড়ো শহর ও শস্য-ব্যাপারিদের বা বনজারার সঙ্গে। মধ্যযুগের শেষদিকে ভারতে অনেক ছোটো শহর (কসবা) গড়ে উঠতে দেখা যায়; এইসব কসবা ছিল শস্য সংগ্রহের আঞ্চলিক কেন্দ্র। শহুরে ভদ্রলোকেরা ছিল এইগুলির বাসিন্দা। এরা নানাভাবে জমির খাজনার ছোটো-খাটো স্বত্বাধিকার — যেমন ওয়কফ, ইনাম, মদদ-ই-মাস ইত্যাদি — ভোগ করত। মধ্যযুগের ভারতে এটি ছিল একটি বিরাট বর্ধিষ্ণু শ্রেণি। এরা উচ্চশ্রেণির লোকের জীবনযাত্রা অনুকরণ করত এবং প্রায়শই যথেষ্ট ঠাটে থাকত।[২৪] আর্থিক দিক থেকে এদের অবস্থা অভিজাতদের সাথে তুলনীয় ছিল না। কিন্তু এরাই ছিল বিভিন্ন বিলাস দ্রব্যের নিয়মিত ভোক্তা। সেগুলি সাধারণত বড়ো শহর থেকে আমদানি করতে হত, তবে কখনো কখনো স্থানীয়ভাবেও উৎপন্ন হত। মুদ্রা অর্থনীতির প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে শস্য-বিক্রেতা ব্যাপারিরা (বানিয়া) হয়ে উঠল মহাজন (যে টাকা ধার দেয়) এবং পোদ্দার (যে মুদ্রা বিনিময় করে)। কৃষকদের হাতে জমির খাজনা দেবার মতো নগদ টাকা প্রায়শই থাকত না, ফলে তারা বাধ্য হত ঐ মহাজনদের কাছে হাত পাততে। গ্রামের বনিয়াদের চরিত্রে এইভাবে সূক্ষ্ম পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল। মূলধনের ক্ষমতার জোরে সে অনেক সময়ই গ্রাম সমাজের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হত। শুধু কৃষকরাই এইসব মহাজনদের দ্বারস্থ হত

তা নয়। খাজনা সংগ্রহের জন্য জায়গিরদারদের স্থানীয় ব্যাপারে ওয়াকিবহাল লোককে প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ করতে হত, এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তা করা হত এই গ্রামীণ ভদ্রমণ্ডলীর মধ্য থেকে। অবশ্য এর জন্য জায়গিরদাররা জামানত হিসেবে মোটা অঙ্কের টাকা (করজ) দাবি করত। আওরঙ্গজেবের শাসনকালের শেষদিকে এটা হয়ে দাঁড়িয়েছিল নিলাম করে জায়গির হস্তান্তরের (ইজারা) প্রচ্ছন্ন ব্যবস্থা — সবচেয়ে বেশি করজ যে দিতে পারত তাকেই জায়গির ইজারা দেওয়া হত।[২৫] যেহেতু এই ইজারাদাররা সাধারণত আর্থিক দিক থেকে কম সঙ্গতিসম্পন্ন হত, তারা টাকার জন্য মহাজনের কাছে হাত পাতত, বিনিময়ে মহাজন মুনাফার বখরা পেত। তাছাড়া, নগদ টাকা লেনদেনের সমস্ত ক্ষেত্রেই পোদ্দারকে প্রয়োজন হত, কারণ একটি মুদ্রার মূল্য নির্ভর করত কোন বছরে সেটি তৈরি হয়েছিল তার এবং ধাতুর শুদ্ধতা ইত্যাদির ওপর, ফলে পোদ্দারকে দিয়ে যাচাই না করিয়ে কেউই নগদ টাকা জমা নিতে চাইত না।[২৬]

এইভাবে মুদ্রা-অর্থনীতির বিকাশের সঙ্গে-সঙ্গে গ্রামাঞ্চলে শস্য-ব্যাপারী তথা মহাজন শ্রেণির আবির্ভাব ঘটেছিল। অনুকূল ঐতিহাসিক পরিস্থিতির সুযোগ পেলে ছোটো ছোটো শহরে বসবাসকারী এই মহাজন-ব্যবসায়ীরা এবং বংশানুক্রমে জমির মালিক গ্রামীণ ভদ্র শ্রেণি একটি সমৃদ্ধ কৃষি অর্থনীতি গড়ে তুলতে পারত।

সবশেষে, বুর্জোয়াদের হাতে তরল পুঁজি বা নগদ অর্থে মূলধনের পুঞ্জিভবন প্রসঙ্গে উল্লেখ্য এমন অনেক তথ্য আছে যার থেকে বোঝা যায় যে প্রভূত আর্থিক মূলধনের মালিক একটি শ্রেণির অস্তিত্ব ছিল। এই শ্রেণিকে দেখা গেছে পশ্চিমের উপকূলবর্তী অঞ্চলে, যাঁরা প্রধানত পশ্চিম এশিয়া ও ইউরোপের সঙ্গে বাণিজ্য করতেন, এবং দক্ষিণ ভারতে (করমণ্ডল উপকূলে), যাঁদের বাণিজ্য ছিল মূলত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে।

বাহারজি বোহরার ('ফ্যাক্টরি রেকর্ডস্'-এ ওয়িরজি ভোরা) খ্যাতি ছিল তাঁর সময়ে পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী ব্যবসায়ী বলে। সুরাট বাজারে তাঁর একাধিপত্য ছিল প্রায় দুই দশক ধরে। আহ্‌মদাবাদ, আগ্রা, বুরহানপুর, গোলকুণ্ডা, মালাবার ও পূর্ব উপকূলে তাঁর শাখা কার্যালয় ছিল। তাঁর নিজস্ব নৌবহর ছিল। এবং কোনো কোনো সময়, তিনি ইংরেজদের জাহাজেও জাভা, বসরা ও গোমব্রুনে পণ্য রপ্তানি করতেন। এরকম আরেক জনের উল্লেখ পাওয়া যায়, তিনি পূর্ব উপকূলের মলয় চেট্টি।[২৭] তাছাড়া, পরবর্তীকালে, পৃথিবীর ধনীতম ব্যবসায়ীদের অন্যতমরূপে অব্দুল গফ্ফর বোহ্‌রার উল্লেখ আছে।[২৮]

বড়ো বড়ো বণিক ছাড়া ছিল পোদ্দাররা, যারা আর্থিক লেনদেন এবং সোনা-রূপো কেনাবেচায় বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠেছিল। এদের অনেকেই লাখ টাকার হুণ্ডি (বিল অব এক্সচেঞ্জ) তক্ষুণি ভাঙিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখত। পরবর্তীকালে, শোনা যায়, বাংলার জগৎ শেঠের নাকি বহু কোটি টাকার হুণ্ডি ভাঙিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা ছিল। পোদ্দারদের দেওয়া হুণ্ডির স্বীকৃতি ছিল ভারতের সর্বত্র এবং এশিয়ার একটি বড়ো অঞ্চল জুড়ে। বাট্টার পরিমাণ ছিল বিস্ময়করভাবে কম। এর থেকে বোঝা যায় যে তখন টাকার প্রাচুর্য ছিল এবং প্রচলিত অর্থব্যবস্থা ছিল উন্নত ধাঁচের। সম্রাট ও অভিজাতরাও দেশের এক থেকে অপর প্রান্তে ধনরত্ন বা খাজনা পাঠানোর কাজে পোদ্দারদের সাহায্য নিতেন।[২৯]

অবশ্য এই সমস্ত অগ্রগতিকে দেখতে হবে ভারতের পুরোপুরি মুদ্রা-অর্থনীতির পুষ্টি ও প্রসারের যেসব প্রাতিষ্ঠানিক অসুবিধা ছিল তার পরিপ্রেক্ষিতে। প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় জাতিভেদ প্রথার। এই প্রথা ছিল সামাজিক গতিশীলতার পক্ষে ভয়ঙ্কর বাধা। তাছাড়া সনাতন গ্রাম সমাজও বিস্ময়কর প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। গ্রামীণ হস্তশিল্প কঠিন লড়াই করে টিকে রয়েছিল বিংশ শতাব্দীর বেশ কিছুকাল পর্যন্ত — সস্তা, মেশিনে তৈরি উৎপন্নের সঙ্গে প্রতিযোগিতা এবং ব্রিটিশ শাসনকালে রাজনীতি ও আইন ব্যবস্থার প্রতিকূলতা সত্ত্বেও।[৩০]